সত্যায়ন
প্রকাশন

কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ

গ্রন্থস্বত্ব ©সংরক্ষিত

ISBN : 978-984-96801-4-7

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৩

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩৩০ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon
www. sottayon.com

যখন নেমে আসে আঁধারের রাত

বেকার, অস্বচ্ছল এবং আর্থিকভাবে নিদারুণ কষ্টে আছে এমন বহু মানুষকেই আমি চিনি, যারা একটা মানসিক অস্থিরতার ভেতর দিয়ে দিন গুজরান করছে। সাধারণত বিপদ-আপদ, দুঃখ-দুর্দশা যখন আমাদের স্পর্শ করে, আমরা তখন খুব বিপন্ন হয়ে পড়ি এবং নিপতিত হই হতাশার ঘন গভীর অন্ধকারে। এমন কঠিন সময়ে আমাদের অন্তর কীভাবে যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। আমাদের ওপরে নিপতিত দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে দুনিয়ার সম্ভাব্য সকল উপায় তখন মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিলেও, যিনি সকল সমস্যার সমাধানকারী—তাঁর দ্বারস্থ হওয়ার কথা আমরা যেন বেমালুম ভুলে যাই।

আমিসহ এমন অনেক মানুষই চারপাশে আছে, যারা জীবনের কঠিন সময়গুলোতে বেশ অগোছালো হয়ে পড়ে। দুঃখ আর দুর্দশার এমন কঠিন সময়গুলোতে সুন্নাহ আর নফল তো দূর থাকুক, ফরয আদায় করতেই কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠি আমরা। আমাদের তখন সালাতে মন বসে না, যিকির-আযকারে মন বসে না, কুরআন তিলাওয়াতে মন বসে না। জীবন তখন আমাদের কাছে হিমালয় ডিঙানোর মতোই দুষ্কর ঠেকে।

কিন্তু এমনটা কি আদৌ হওয়ার কথা ছিলো?

মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের একটা ঘটনা আমাকে বেশ ভাবনার মধ্যে ফেলে দেয়। দুঃখ আর দুর্দশার দিনে মূসা আলাইহিস সালামের অন্তরের দৃঢ়তা আর চিন্তার প্রখরতা আমাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে—আমার জীবনের দর্শনটাই উল্টেপাল্টে যায়।

যুবক অবস্থায় একবার এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হয়ে মূসা আলাইহিস সালামকে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মাদইয়ান নামক একটা জায়গায় পালিয়ে আসতে হয়। মাদইয়ানে মূসা আলাইহিস সালামের আসার ঠিক পরের একটা

ঘটনা কুরআন বেশ গুরুত্ব সহকারে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সেই ঘটনায় দেখা যায়—দুজন নারী তাদের বকরিকে পানি পান করাতে এসে একটা কূপের অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দাঁড়িয়ে থাকবার কারণ হচ্ছে—ওই সময়টায় কূপে কিছু পুরুষ মানুষ তাদের নিজ নিজ বকরিকে পানি পান করাচ্ছিলো। যেহেতু কূপের কাছে যারা আছে তারা সকলেই পুরুষ, তাই নারীদ্বয় ওই মুহূর্তে কূপের নিকটে না গিয়ে, অদূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাটাকেই নিজেদের জন্য সমীচীন মনে করলো। পুরুষেরা তাদের কাজ সেরে চলে গেলে তারা কূপের নিকটে যাবে এবং বকরিকে পানি পান করাবে—এমনটাই তাদের পরিকল্পনা।

মাদইয়ানে মূসা আলাইহিস সালাম তখন সদ্য পা রেখেছেন। এবং ঘটনাক্রমে ওই কূপের কাছেই একটা গাছের নিচে বসে ছিলেন তিনি। কূপে পুরুষদের আনাগোনা এবং অদূরে দুজন নারীর দাঁড়িয়ে থাকা এবং কূপের কাছে তাদের ঘেঁষতে না পারার বিষয়টা নজর কাড়লো মূসা আলাইহিস সালামের।

মেয়ে দুটো যেহেতু নিজেদের বকরিকে পানি পান করাতে পারছে না, তাই মূসা আলাইহিস সালাম তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তাদের বকরিগুলোকে কূপ থেকে পানি পান করিয়ে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিলেন এবং যে গাছটির নিচে বসা ছিলেন আগে, পুনরায় সেই গাছের নিচে এসে বসে পড়লেন।

গাছের নিচে ফিরে এসে তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে একটা দুআ করেছিলেন সেদিন। সেই দুআটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এতো পছন্দ করলেন যে, সেটাকে তিনি গোটা মানবজাতির জন্য কুরআনে স্থান করে দিয়েছেন। কিয়ামত-কাল অবধি সেই দুআ আমরা পাঠ করবো—সালাতে, নিজেদের বিপদে-আপদে, নিজেদের সুখ আর দুঃখের দিনে।

গাছের নিচে ফিরে এসে মূসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন:

> رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾
>
> “আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি দান করবেন, আমি তার-ই মুখাপেক্ষী।”[১]

১. সূরা কাসাস, ২৮ : ২৪।

খেয়াল করুন—নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে মাদইয়ানে পালিয়ে এসেছেন তিনি। মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই পর্যন্ত কোথাও নেই। নেই কোনো খাবারের বন্দোবস্ত। কী খাবেন, কী পরবেন, বাকি দিনগুলো কীভাবে কাটাবেন—কোনোকিছুই জানেন না তিনি।

সম্পূর্ণ নতুন এক জায়গায় যদি আপনাকে রেখে আসা হয়, যেখানে আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব নেই, কোনো পরিচিত লোক নেই, এমনকি আপনার হাতে একটা পয়সাও নেই যে আপনি থাকা-খাওয়ার সংস্থান করবেন, ভাবুন তো—এমন একটা অবস্থায় পড়লে আপনার মনের অবস্থাটা কী হবে? আল্লাহর কাছে যদি দুআ করতে হয়, আপনি তখন কীরকম দুআ করবেন?

আমি জানি আপনি কী দুআ করবেন। আপনি বলবেন— 'ইয়া আল্লাহ, আমাকে থাকার একটা জায়গা মিলিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ, আমাকে খাবারের বন্দোবস্ত করে দিন। ইয়া আল্লাহ, আপনি এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমার জন্য একটা উত্তম আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিন।'

কিন্তু দেখুন—এরকম একটা নাজুক পরিস্থিতিতে পড়েও মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে সেভাবে দুআ করেননি। তিনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাননি, মাথা গোঁজার ঠাঁই চাননি, এমনকি একবেলা আহারের ব্যবস্থার জন্যও দুআ করেননি। বরং তিনি বললেন—'আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি দেখাবেন, আমি তার-ই মুখাপেক্ষী!'

'আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি দেখাবেন'—এই কথাটার মানে কী?

মানে হলো—যদি আপনি আমাকে খেতে দেন তো আলহামদুলিল্লাহ, খেতে না দিলেও আলহামদুলিল্লাহ। আমাকে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিলেও আলহামদুলিল্লাহ, যদি আমাকে নিরাশ্রয় করে রাখেন, তা-ও আলহামদুলিল্লাহ। আমার জন্য যা কিছুই আপনি নির্ধারণ করবেন—আমি নিঃসংকোচে, নির্ভাবনায় সেগুলোকে মাথা পেতে নেবো।

আরও লক্ষণীয়—একটু আগেই কিন্তু তিনি দুজন নারীর বকরিকে পানি পান করিয়ে তাদের উপকার করেছিলেন। তিনি যদি চাইতেন, সেই কাজটাকে উসিলা করে হলেও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে পারতেন। তিনি বলতে

পারতেন—'আমার রব! খানিক আগেই আমি আপনার দুজন নিরীহ বান্দার উপকার করেছি। তারা তাদের বকরিকে পানি পান করাতে পারছিলো না। আমি দয়াপরবশ হয়ে তাদের বকরিগুলোকে কূপ থেকে পানি তুলে খাইয়েছি। আমার এই কাজ যদি আপনি পছন্দ করে থাকেন, এর উসিলায় হলেও আপনি আমাকে মাদইয়ানে একটা থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।'

এভাবে চাওয়াটা মূসা আলাইহিস সালামের জন্য অসংগত ছিলো না মোটেও। কিন্তু তিনি সেভাবে চাইলেন না। পুরো ব্যাপারটার ভার তিনি আল্লাহর ওপরে ন্যস্ত করে দিয়ে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে সিদ্ধান্তই তাঁর জন্য স্থির করবেন—সেটাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

আল্লাহর ওপর এই যে ভরসা, বিপদের দিনে আল্লাহর প্রতি এই যে নির্ভরতা, এই নির্ভরতা আমাদের মাঝে আজ কোথায়? ঘনঘোর বিপদে তাঁরা অভিভাবক হিশেবে আল্লাহকে বেছে নিতেন, ঝুঁকে পড়তেন তাঁর সিদ্ধান্তে, নত মস্তকে মেনে চলতেন তাঁর নির্দেশনা। আর আমরা? সামান্য বিপদ-আপদে আল্লাহর কাছাকাছি যাওয়ার বদলে, আমরা বরং আল্লাহর কাছ থেকে আরও বেশি দূরে সরে যাই।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ওপর সত্যিকার অর্থেই যে নির্ভর করে, আল্লাহ অতি-উত্তমভাবে তার অভিভাবক হয়ে যান। মহান রবের ওপরে নিশ্চিন্তমনে নির্ভরতার ফল মূসা আলাইহিস সালাম কিন্তু সাথে সাথেই পেয়েছিলেন সেদিন। কুরআন আমাদের জানায়—খানিক বাদেই মেয়েদের একজন এসে মূসা আলাইহিস সালামকে বলেন, 'আমার আব্বা আপনাকে ডাকছেন। আপনি আমাদের বকরিকে পানি পান করিয়েছেন, তাই আমার আব্বা আপনাকে এর বিনিময় দিতে চান।'

দুআর কী তাৎক্ষণিক প্রতি-উত্তর চিন্তা করুন! একেবারে খালি হাতে, বিদেশ-বিভুঁইয়ে, অচেনা-অজানা কোনো এক দেশের কোনো এক লোক তাঁকে ডাকছেন বিনিময় প্রদান করার জন্য! এই তো একটু আগেই তিনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে হাত তুলে বলেছেন—'যে অনুগ্রহই আপনি আমাকে দেবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী', আর খানিকটা পরেই তাঁর জন্য বিনিময় প্রদানের সংবাদ সমেত একজন এসে হাজির হয়ে গেলেন।

আপনি জানেন মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেদিন বিনিময় হিশেবে কী দিয়েছিলেন? একটা উত্তম আশ্রয়, একজন সৎকর্মশীলা স্ত্রী এবং একটা সুন্দর গোছানো পরিবার।

মূসা আলাইহিস সালাম কিন্তু আল্লাহর কাছে এসবের কিছুই চাননি। তিনি না আশ্রয় চেয়েছেন, না চেয়েছেন সঙ্গী হিশেবে একজন স্ত্রী, অথবা মিলেমিশে থাকার জন্য কোনো পরিবার। তিনি স্রেফ বলেছেন—আপনি যে অনুগ্রহ আমাকে দেবেন, আমি তাতেই খুশি। নিজের ইচ্ছাকে নয়, মূসা আলাইহিস সালাম বরণ করে নিয়েছিলেন আল্লাহর ইচ্ছাকেই। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছেন আশ-শাকূর তথা উত্তম বিনিময় দাতা। দাতা হিশেবে তাঁর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। দেওয়া না-দেওয়ার ভারটা মূসা আলাইহিস সালাম ন্যস্ত করেছিলেন আল্লাহর ওপর। তিনি তাওয়াক্কুল করেছিলেন কেবল তাঁর প্রতিপালকের ওপর—দুনিয়ার আর কোনো সত্তার ওপর নয়। আর যারা কেবল আল্লাহর ওপরে তাওয়াক্কুল তথা নির্ভরশীল হয় তাদেরকে মহান রব কীভাবে রিয্ক প্রদান করেন জানেন?

> يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ
>
> "এবং (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা) তাকে এমন উৎস থেকে রিয্ক প্রদান করবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"[২]

মুখ ফুটে কিছু না চাওয়ার পরেও মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কল্পনাতীত উৎস থেকে রিয্ক প্রদান করেছেন। একটু আগেও তিনি ভাবতে পারেননি যে—যে কন্যাদ্বয়ের বকরির পালকে তিনি পানি খাওয়াচ্ছেন, তাদের পিতা তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেন, থাকার আশ্রয় দেবেন এবং কন্যাদের একজনকে তার সাথে বিয়ে দেবেন। রিক্ত হস্তে আসা একজন দেশান্তরীকে মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পাইয়ে দিয়েছেন জীবনে বাঁচবার জন্য যা-কিছু দরকার, তার সবটাই। খানিক আগেও যা ছিলো কল্পনারও অতীত, খানিক বাদেই তা হয়ে উঠলো দিবালোকের ন্যায় বাস্তবতা। কী অসীম দয়া আমার রবের! কতো প্রাচুর্যময় তিনি!

---

২. সূরা তালাক, ৬৫ : ০৩।

মূসা আলাইহিস সালাম আমাদের শিখিয়েছেন—দুঃখ আর দুর্দশার দিনে অস্থিরচিত্ত না হয়ে, দিশেহারা না হয়ে আল্লাহর দিকে নিবিড়ভাবে ঝুঁকতে হয়। নিজেকে আরও বেশি করে ব্যাপৃত রাখতে হয় আল্লাহর স্মরণে। তাঁর সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে মেনে নিতে হয় এবং সর্বাবস্থায় নির্ভর করতে হয় তাঁরই ওপরে।

দুনিয়াতে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ভূরিভূরি বই, লেকচার, আর্টিকেল আর তত্ত্বকথা পাওয়া যাবে। কিন্তু মূসা আলাইহিস সালামের এই একটা দুআকে যদি আপনি জীবনে ধারণ করতে পারেন, যদি ঘনঘোর বিপদের দিনেও আপনি সন্তুষ্টচিত্তে বলতে পারেন, 'আমার রব! আমার প্রতি যে অনুগ্রহই আপনি করবেন, আমি তার-ই মুখাপেক্ষী', বিশ্বাস করুন—এর চেয়ে ভালো কোনো ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের পাঠ দুনিয়ার কোথাও আপনি শিখতে পারবেন না।

নীল দরিয়ার জলে

১

দরিয়ার কাছাকাছি এলে আমার দুজন পয়গম্বরের কথা মনে পড়ে যাদের একজন মূসা আলাইহিস সালাম। মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের গল্পটা একটু অদ্ভুত—অন্য নবি-রাসূলদের চাইতে খানিকটা আলাদা। তাঁর জীবনের শুরুটাই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। পাপিষ্ঠ ফিরআউনের হাত থেকে বাঁচাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নির্দেশে মূসা আলাইহিস সালামের মা একটা বাকশোতে পুরে শিশু মূসা আলাইহিস সালামকে দরিয়ার পানিতে নিক্ষেপ করেন।

দৃশ্যটা একবার ভাবুন তো—একটা দুধের শিশুকে বাকশোতে ভরে দরিয়ায় নিক্ষেপ করে দিচ্ছে একজন মা! পৃথিবীর কোনো মায়ের পক্ষেই কি এ-ধরনের একটা কাজ সম্ভব? আপনার আম্মা কি পারতেন আপনাকে খুব ছোটোবেলায় ঠিক এভাবে বাকশো-বন্দী করে দরিয়ায় নিক্ষেপ করতে? অথবা—আপনার দ্বারা কি সম্ভব আপনার দুধের সন্তানকে বাকশোর মধ্যে ঢুকিয়ে পানিতে ছুড়ে মারা?

দুনিয়ার কোনো মা-ই এটা করতে পারে না। নারীত্বের মমতার অংশটা, মাতৃত্বের গভীর দরদটা এই জায়গায় এসে ভীষণভাবে থমকে যেতে বাধ্য। মূসা আলাইহিস সালামের মা-ও কিন্তু পারতেন না। তিনিও তো মা। মূসা আলাইহিস সালামকে তিনি গর্ভে ধরেছেন নয়টা মাস। সেই নাড়িছেঁড়া বুকের মানিককে কীভাবে তিনি নিক্ষেপ করবেন অকূল দরিয়ায়?

যেহেতু তিনি মা, তাঁর দ্বারা যে এই কাজটা বেজায় অসম্ভব, তাঁর মন যে এই কাজে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, সন্তানের জন্য তাঁর হৃদয় যে গভীর

মমতা থেকে হাহাকার করে উঠবে—তা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে আল্লাহর চাইতে ভালো আর কে জানবেন দুনিয়ায়! মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের মনের অবস্থাটাও আল্লাহর কাছে গোপন ছিলো না। কিন্তু জালিম ফিরআউনের হাত থেকে শিশু মূসাকে বাঁচাতে হলে খানিকটা নির্মম, খানিকটা নির্দয় যে হতেই হবে! এমন নির্দয় আর নির্মমতার মুহূর্তে মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের অন্তর যাতে সুকূন তথা প্রশান্তি লাভ করে, যাতে কেটে যায় তাঁর মনের সকল ভয় আর শঙ্কা—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে শোনালেন আশ্বাসবাণী :

> فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٧
>
> "যখন তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবেন, তখন তাকে নিক্ষেপ করবেন দরিয়ায়। আর একদম ভয় পাবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। নিশ্চয় আমি তাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করে নেবো।"[৩]

বনি ইসরাঈলিদের ঘরে কোনো নবজাতক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরআউন বাহিনী এসে সেই নবজাতকদের হত্যা করে ফেলতো। ফিরআউনের একটা স্বপ্নের ব্যাখ্যায় একজন জ্যোতিষী জানিয়েছিলো—বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়ে এমন একজন নবির আগমন ঘটবে, যার হাতে ফিরআউনের মৃত্যু হবে। নিজের মৃত্যু ঠেকাতে তাই ফিরআউন বনি ইসরাঈলিদের ঘরে জন্ম নেওয়া সকল নবজাতককে ধরে ধরে হত্যা করতো। অর্থাৎ—ভবিষ্যতে যে নবির হাতে ফিরআউনের মৃত্যু হবে বলে জানিয়েছিলো জ্যোতিষী, তাকে যেন জন্মের সাথে সাথেই মেরে ফেলা যায়। কিন্তু দুনিয়াতে কেউ তো তার ভাগ্যলিপিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না। ফিরআউনও পারেনি।

জালিম ফিরআউনের এই পাশবিকতা থেকে মূসা আলাইহিস সালামকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মূসা আলাইহিস সালামের মা'কে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোলের শিশুকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দিতে। আল্লাহর সেই আশ্বাসবাণী পেয়ে মূসার জননী আর দেরি করলেন না। একটা বাকশো-বন্দী করে শিশু

৩. সূরা কাসাস, ২৮ : ০৭।

মূসাকে তিনি ভাসিয়ে দিলেন অকূল দরিয়ার জলে। সেই থেকে দরিয়া জড়িয়ে গিয়েছে নবি মূসার জীবনে।

মূসা আলাইহিস সালামের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে নান্দনিক যে পরিণতি—সেখানেও আছে দরিয়ার উপস্থিতি। আমরা জানি—নবি মূসা আলাইহিস সালাম এবং তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দরিয়ায় তৈরি করে দিয়েছিলেন পথ এবং ওই একই দরিয়ায় তলিয়ে মেরেছিলেন জালিম ফিরআউন ও তার বাহিনীকে। জীবনের চরম সংকটময় এই মুহূর্তে মূসা আলাইহিস সালামের অবস্থান আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করে রাখে।

সামনে অকূল দরিয়া আর পশ্চাতে ফিরআউনের বিশাল বহরের শক্তিশালী বাহিনী! এ যেন জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘের গল্পটার মতোই—দুই জায়গাতেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি! অবস্থা বেগতিক দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলো বনি ইসরাঈল সম্প্রদায়। তারা বললো,

> إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦١﴾
>
> "আমরা বুঝি ধরা পড়েই গেলাম।"[৪]

অন্য সকলের মতো মূসা আলাইহিস সালামও দেখছিলেন যে—সম্মুখে যতোদূর চোখ যায় কেবল পানি আর পানি! নেই কোনো নৌকা, পারাপারের বাহন। আর পশ্চাতে একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে চিরশত্রু ফিরআউন! তিনি না সম্মুখে যেতে পারছেন, না পারছেন পেছনে যাত্রা করতে। দৃশ্যত অন্য সকলের মতো তার সামনেও যাওয়ার আর কোনো রাস্তা খোলা নেই।

কিন্তু অন্য সবার মতো তিনি ঘাবড়ে গেলেন না। যদিও খালি চোখে সম্মুখে উপনীত বিপদ এড়াবার কোনো পথ তিনি দেখছেন না, তবুও একেবারে নির্ভয় আর নির্ভার থেকে তিনি অন্যদেরকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে—

> كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾
>
> "কখনোই নয়। আমার রব আমার সাথে আছেন। তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন।"[৫]

---

৪. সূরা শুআরা, ২৬ : ৬১।

৫. সূরা শুআরা, ২৬ : ৬২।

সম্মুখে অকূল পাথার আর পশ্চাতে ঘাড়ের ওপর পড়তে যাচ্ছে শত্রুর নিশ্বাঃস! এর মধ্যে পথ কোথায় পাওয়া যাবে? পথ যে কোথায় পাওয়া যাবে তা মূসা আলাইহিস সালাম নিজেও জানেন না। তবে তিনি এটুকু জানেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁকে পথ অবশ্যই দেখাবেন।

এরপর যা ঘটলো, তা তো রূপকথাকেও হার মানিয়ে দেয়! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দরিয়ায় মূসা আলাইহিস সালামের জন্য তৈরি করে দিলেন পথ। আর পশ্চাতে যে শত্রু পিছু নিয়েছিলো, তাকে ডুবিয়ে মারলেন ওই দরিয়ার জলেই।

ওইদিন মূসা আলাইহিস সালাম কল্পনাও করতে পারেননি যে—তাঁর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমুদ্রের মধ্যে পথ তৈরি করে দেবেন। তিনি শুধু এটুকু জানতেন—তাঁর রব তাঁর সাথে আছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যার সাথে থাকেন তিনি পথের কথা ভাবেন না, ভাবেন পথের মালিকের কথা। মূসা আলাইহিস সালামও পথের মালিকের স্মরণে বিভোর ছিলেন সেদিন।

২

দরিয়ার কাছাকাছি এলে দ্বিতীয় যে পয়গম্বরের কথা আমার মানসপটে ভেসে ওঠে, তিনি হলেন নবি ইউনুস আলাইহিস সালাম। জীবনে এক সুকঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো তাঁকে। উত্থাল সমুদ্র একদিন তাঁকে নিক্ষেপ করেছিলো ফেনিল জলরাশিতে আর নবি ইউনুস আলাইহিস সালামকে গলাধঃকরণ করে নেয় এক বিশালকায় মাছ।

গভীর সমুদ্রের তলায়, একটা মাছের পেটে বন্দী হয়ে পড়াটাকে চোখ বন্ধ করে একবার চিন্তার মধ্যে আনবার চেষ্টা করুন। কেমন সেই অবস্থা? ভাবতে গেলেও কেমন গা শিউরে ওঠে, তাই না? কল্পনাও অতোদূর পৌঁছাতে হিমশিম খেয়ে যায়। কিন্তু সমুদ্রের সেই গভীরতম তলা থেকে, মাছের পেটের সেই নিশ্চিদ্র বন্দীত্ব থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইউনুস আলাইহিস সালামকে ঠিক ঠিক বাঁচিয়ে এনেছিলেন।

যেখানে কোনো রাস্তা থাকে না, সেখানে তিনি রাস্তা তৈরি করে দেন। যেখানে থাকে না বাঁচার কোনো আশা, সেখানেও তিনি ফুরোতে দেন না প্রাণের ফোয়ারা। যেখানে কেবল অন্ধকার আর অন্ধকার, সেখানেও তিনি জ্বালিয়ে দেন একমুঠো আলো।

তবে দুনিয়ার সকল অসম্ভবকে তিনি কাদের জন্য সম্ভব করে দেন, বলতে পারেন? কুরআন বলছে—

> وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ۝٢
>
> 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তৈরি করে দেন (বিপদ হতে) উত্তরণের পথ।'[৬]

দরিয়া আমাকে খুব করে টানে। নীল দরিয়ার জলের কাছাকাছি এলে আমার মনে পড়ে যায় মূসা আলাইহিস সালাম আর ইউনুস আলাইহিস সালামের কথা। আমার অন্তরাত্মার ভেতরে প্রশ্ন জাগে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে তাঁরা যেভাবে ভয় করেছিলেন, যার কারণে সমুদ্রের বিপদ হতে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন অকল্পনীয় উপায়ে, সেরকম ভয় কি আল্লাহকে আমি করতে পারছি? জীবনে তো বিপদের অন্ত থাকে না, কিন্তু যদি আল্লাহকে যথাযথ ভয় না-ই করতে পারি, কীভাবে আশা করতে পারি যে—আমার জন্যও তিনি বের করে দেবেন উত্তরণের পথ?

---

৬. সূরা তালাক, ৬৫ : ০২।

দুঃখের আলপনায় স্বস্তির রং

১

আমাদের নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট নিয়ে আমরা যখন কুরআনের কাছে আসি, কুরআন তখন চমৎকারভাবে তা উপশমের উপায় বাতলে দেয়। কুরআন আমাদের মিছেমিছি সান্ত্বনা দেয় না। অথবা—আমাদের দুঃখ-কষ্টকে অগ্রাহ্য করে সেসব এড়িয়েও যায় না। দুঃখবোধ উপশমে কুরআন আমাদের এমন এক পথ বাতলে দেয়, যা বাস্তব এবং যা ব্যক্তির মানসিক গঠনের জন্য বিস্ময়করভাবে সহায়ক। দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে কুরআনের ভাষ্য হলো—

> فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝
>
> "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।"[৭]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন স্বস্তি রয়েছে দুঃখ-কষ্টের মাঝে। আপাতদৃষ্টিতে দুটো বিষয়কে সম্পূর্ণ বিপরীত মনে হলেও, কুরআনের ভাষ্যমতে দুটো বিষয় যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কষ্টের সাথে স্বস্তি কীভাবে থাকতে পারে? আমি বোঝার চেষ্টা করলাম।

ধরা যাক একজন লোকের ঘরে কোনো খাবার নেই। ক্ষুধায়-অনাহারে সকলে ক্লান্ত। চরম দুঃখ-কষ্টে কাটছে তাদের দিন। এমতাবস্থায় তার জন্য স্বস্তি কোথায়?

মজার ব্যাপার হচ্ছে—স্বস্তি বা সুখ যা-ই বলি না কেন, সেটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করেছি টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ আর সচ্ছলতা দিয়ে। এসবের অনুপস্থিতিকে আমরা বুঝি দারিদ্র আর দুঃখ-কষ্ট হিশেবে। সুখকে এভাবে বুঝতে গিয়ে মাঝখান

---

৭. সূরা ইনশিরাহ, ৯৫ : ০৫।

থেকে আমরা যে সত্যিকার জিনিসটাকে পাশ কেটে যাই, তা হলো—অন্তরের প্রশান্তি। খুবই দুঃখ আর দারিদ্রের মধ্যে বাস করেও, নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশার ভেতর দিয়ে গেলেও একজন মানুষের অন্তরে প্রশান্তি থাকতে পারে। আবার দুনিয়ার সেরা ধনী ব্যক্তি হয়েও, দুনিয়াজোড়া নাম-ডাক থাকা সত্ত্বেও একজন ব্যক্তির অন্তর সর্বদা বিক্ষিপ্ত আর বিষণ্ন থাকতে পারে।

যে ব্যক্তির ঘরে খাবারের সংকট, সে যদি তার সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করে এবং তারপরও পর্যাপ্ত খাবার জোগাড়ে ব্যর্থ হয়, পরিবারের সকলকে নিয়ে সে যে শাক-ভাত খাচ্ছে, নতুবা একবেলা খেয়ে একবেলা উপোস করছে—তাতে কিন্তু তার আফসোস থাকে না কোনো। সে জানে এটুকুই তার রিয্ক। সে এটাকেই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয়। তার সামনে যদি হারাম পথে পা বাড়িয়ে রিয্ক তালাশের কোনো সুযোগ আসে, যেমন—চুরি-ডাকাতি করা, অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া, লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করা—এমন সুযোগকে সে পায়ে ঠেলে দেয়। কারণ সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ভয় পায়। পরিবার নিয়ে সে উপোস করতে করতে মরে যেতে রাজি, কিন্তু হারামের পথে এক কদম দিতে সে রাজি নয়।

নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও তাকওয়ায় টইটম্বুর অন্তর নিয়ে যখন সে সালাতে দাঁড়ায়, দুনিয়ার সকল দাতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যখন সে চোখের পানি ফেলে কেবল সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা 'আর-রাযযাক'-এর দিকে মুখ ফেরায়, তখন ক্ষুধা-অনাহারের কষ্ট, সংসারের ঘানি টানবার অপরিসীম ক্লান্তি—সমস্তকিছুকে তার সাময়িক পরীক্ষা মনে হয় এবং সে জানে এর উত্তম প্রতিদান তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অন্তত দুনিয়াতে না হোক, অনন্ত আখিরাতে তার রব তাকে এতো পরিমাণ দেবেন যে সে খুশি হয়ে যাবে।

আবার দুনিয়া-সেরা কোনো এক ধনী লোক, ধরা যাক তার বি-শা-ল একটা ব্যবসায়িক প্রজেক্ট একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে মুখ থুবড়ে পড়লো। এখন তার অন্তরে যদি তাওয়াক্কুল না থাকে, এই প্রজেক্টকে সে যেকোনোপ্রকারে, ন্যায়-অন্যায়ের বাছ-বিচার না করে দাঁড় করাতে চাইবে। তাতে কার কী ক্ষতি হলো, কার কী এলো-গেলো তা নিয়ে সে একটুও ভাববে না। সে শুধু ব্যবসা বোঝে আর বোঝে টাকা। কেবল টাকা হাতে এলেই সে শান্তি পায়।

তার অন্তরে যদি তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর ওপর ভরসা না থাকে, তার এহেন ক্ষতিকে সে 'তাকদীর' হিশেবে মেনে নিতে চাইবে না। এই ক্ষতিকে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা এবং এর বিনিময়ে দুনিয়া কিংবা আখিরাতে উত্তম বিনিময় লাভের যে ধারণা ইসলাম দেয়—সেটাকে সে পাত্তা দেবে না। ফলে তার যদিও অঢেল সম্পদের পাহাড়, তথাপি যেকোনো ক্ষতিতে, যেকোনো সমস্যায় সে বিচলিত হয়ে পড়ে। তার অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয় প্রশান্তি। এমন বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন আর বিষণ্ন অন্তর নিয়ে সে যদি কোটি টাকার বিছানায় ঘুমায়, দুনিয়ার সেরা মডেলের গাড়িতে চড়ে, তবুও সেই শান্তি সে পায় না, যে শান্তি ক্ষুধা পেটে নিয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ওই দরিদ্র ব্যক্তি পায়।

২

সূরা আল-ইনশিরাহতে 'কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি' কথাটা পরপর দুইবার উল্লেখ করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাফসীর ইবনু কাসীরে একই আয়াত একেবারে হুবহু শব্দচয়নে দুইবার উল্লেখের একটা সুন্দর ভাষাতাত্ত্বিক দিক আলোচনায় এসেছে। আরবি ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—আলিফ এবং লাম যুক্ত শব্দকে পুনরায় যদি আলিফ এবং লাম যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়, তাহলে উভয় শব্দের অর্থ একই থাকে, বদলায় না। তবে যদি একই শব্দ পরপর ব্যবহার করা হয়, কিন্তু তাতে আলিফ আর লাম যুক্ত না থাকে, তাহলে দুই শব্দ দিয়ে সবসময় একই বস্তু বোঝাবে না।

সূরা আল-ইনশিরাহতে 'কষ্ট' বোঝাতে দুই আয়াতেই عُسْرٌ (উস্‌র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুই জায়গাতেই শব্দটার সাথে আলিফ এবং লাম যুক্ত আছে। অর্থাৎ—দুই জায়গায় এই শব্দ দিয়ে মূলত একটা জিনিসকেই বোঝানো হয়েছে, আর তা হলো—কষ্ট। কিন্তু ওই একই আয়াত দুটোতে 'স্বস্তি' বোঝাতে যে শব্দ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যবহার করেছেন তা হলো— يُسْرٌ (ইউস্‌র)।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, কষ্ট বোঝাতে তিনি যে 'উস্‌র' শব্দ নির্বাচন করেছেন তাতে আলিফ আর লাম যুক্ত থাকলেও, স্বস্তি বোঝানোর জন্য যে 'ইউস্‌র' শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তার কোনোটাতেই আলিফ-লাম নেই।

কুরআনের ভাষাবিদেরা বলছেন—আয়াত-দ্বয়ে 'উস্‌র' শব্দের সাথে আলিফ আর লাম যুক্ত থাকায় তা দিয়ে একটা জিনিসই বোঝানো হয়েছে—কষ্ট। কিন্তু, আয়াত-দ্বয়ে 'ইউস্‌র' শব্দের সাথে আলিফ-লাম যুক্ত না থাকায় তা দিয়ে 'একই স্বস্তি' বোঝানো হয়নি, বরং হরেক রকমের স্বস্তি তথা পুরস্কারকে বোঝানো হয়েছে।[৮]

একেবারে সহজ করে যদি বলা হয়—সূরা আল ইনশিরাহতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একইরকম কষ্টের বিনিময়ে বান্দাকে হরেক রকমের প্রতিদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বান্দা যে দুঃখ-কষ্টগুলো ভোগ করে দুনিয়াতে, তার বিপরীতে সে পাবে অনেক অনেক বেশি প্রতিদান।

কুরআনে বর্ণিত নবি-রাসূলদের ঘটনাগুলোতে চরম দুঃখ-কষ্টের মাঝেও তাদেরকে যে আমরা খুব স্থিরচিত্ত হিশেবে দেখি, এর কারণ হলো এই—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার এই প্রতিদানের ব্যাপারে তারা ছিলেন সম্যক অবগত। কষ্টের সাথে তখনই স্বস্তি থাকে, যখন অন্তরে তাকওয়া আর তাওয়াক্কুলের জোয়ার আসে।

৮. তাবারি, তাফসীর, ২৪/৪৯৬; ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৮/৪৩২; সা'লাবি, তাফসীর, ৫/৬০৫; বাগাবি, তাফসীর, ৮/৪৬৫।